কৃষক আন্দোলন
(Peasant Movements)

ড. অনিরুদ্ধ চৌধুরী

ভারতীয় কৃষক (Indian Peasants)

চাষ আবাদের সঙ্গে যুক্ত মানুষদেরই সাধারণভাবে কৃষক (Peasant) বলা যায়। কৃষকসমাজ সম্পর্কে জনপ্রিয় ধারণা হলো যে তারা একটি সমসত্ত্বধর্মী গ্রামীণ বর্গ (Homogeneous Rural category)। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। পক্ষান্তরে, তাদের মধ্যে প্রচুর বিষমসত্ত্বতা (heterogeneity) ও স্তরবিভাজনও দেখা যায়। সমাজবিজ্ঞানীরা ভারতের কৃষকসমাজের বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের বৈশিষ্ট্যগুলিকে চিহ্নিত করার প্রয়াস করে যাচ্ছেন। বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক অধ্যাপক আঁদ্রে বেতের (Andre Beteille) এ বিষয় নিয়ে গবেষণাধর্মী প্রয়াস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত তাঁর 'স্টাডিজ ইন অ্যাগ্রারিয়ান সোশ্যাল স্ট্রাকচর' গ্রন্থে আমরা সে সম্পর্কে বিশদে জানতে পারি। তাঁর মতে, ভারতীয় সমাজের প্রেক্ষাপটে 'কৃষক' শব্দটি ব্যাপক অর্থ বহন করে। যদিও তিনি মনে করেন যে কাজের ধরণ বা জমির মালিকানার ধরণ-এর কোনোটিকে ভিত্তি করে ভারতীয় কৃষকদের পুরোপুরি শ্রেণি বিভাজন করা কঠিন কাজ। তবুও তিনি সাধারণভাবে কৃষকদের কৃষিজমির মালিকানার ভিত্তিতে মালিকানাসত্ত্বযুক্ত এবং মালিকানাসত্ত্ববিহীন—এই দুটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি সচেতন যে এই দুই শ্রেণির কৃষকের বাইরেও খুব স্বল্প জমির মালিক স্বনির্ভর কৃষকদের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায় যারা নিজেরাই কায়িক শ্রমে চাষাবাদ করে থাকেন।

যে সব কৃষক পরিবারগুলির সদস্যরা পুরোপুরিভাবে কিংবা কিছুটা পরিমাণে কৃষিতে কায়িক শ্রম দেন তাদের একটি ক্ষুদ্র উৎপাদক গোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত করা যায়, যারা একদিকে বৃহৎ কৃষক ও জোতদার এবং অন্যদিকে কায়িক কৃষি শ্রমিকদের মধ্যবর্তী একটি বর্গ নির্মাণ করে।

অধ্যাপক আঁদ্রে বেতে জমির মালিকানাসত্ত্বযুক্ত কৃষকদের আবার দুভাগে ভাগ করেছেন। একদিকে বৃহৎ জমির মালিক এবং তারা মূলত সেই জমিতে চাষাবাদে কায়িক

শ্রম করে না আর অন্যদিকে যারা অল্প জমির মালিক এবং নিজেদের জমির চাষাবাদে নিজেরাই কায়িক পরিশ্রম করে। অর্থাৎ এই ভাগ মূলত ধনী কৃষকের সাথে মধ্যস্তরী ও দরিদ্র কৃষকদের পার্থক্যকে তুলে ধরে।

সমাজতান্ত্রিক আঁদ্রে বেতে জমির মালিকানাসত্ত্বহীন কৃষকদের মধ্যে দুটি ধরণের কথা উল্লেখ করেছেন। সাধারণভাবে বলতে গেলে এই কৃষকরা অন্যের মালিকানাধীন জমিতে চাষাবাদের কাজ করে। এদের মধ্যে এক অংশের প্রজাসত্ত্বের মোটামুটি স্থায়ী অধিকার থাকে আর অন্য অংশের প্রজাসত্ত্বের কোনো রকম অধিকারই থাকে না।

অধ্যাপক বেতে জমির উপর মালিকানার ধরণের পাশাপাশি জমিতে কাজের ধরণকে ভিত্তি করে কৃষকদের দুভাগে ভাগ করেছেন—এক অংশের কৃষক যারা কায়িক শ্রমের মাধ্যমে চাষাবাদে যুক্ত থাকে এবং অন্য আর এক অংশ যারা মূলত তত্ত্বাবধানমূলক কাজে নিযুক্ত থাকে।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রজাসত্ত্বের মধ্যে অনেক বৈচিত্র্য রয়েছে। অনেক অঞ্চলেই প্রজাসত্ত্বের চুক্তি সাধারণত অনথিভুক্ত, মৌখিক ও স্বল্প সময়ের জন্য। চাষের ধরণ ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রজাসত্ত্বের প্রকরণগুলির মধ্যে পরিবর্তন সংঘটিত হচ্ছে, বহু অঞ্চলে নতুন নতুন প্রজাসত্ত্ব ব্যবস্থাও গড়ে উঠতে দেখা যাচ্ছে। কৃষক পরিবারগুলির কতজন কৃষিকাজে অংশগ্রহণ করবে তা মূলত নির্ভর করে প্রতি অঞ্চলে জমি ব্যবহারের প্রকৃতি ও চাষের ধরণের উপর এবং পাশাপাশি কৃষক পরিবারগুলির আর্থিক ও সামাজিক মর্যাদার ওপর।

কৃষকসমাজের বিভিন্ন স্তর গড়ে ওঠার প্রক্রিয়াকে অনুধাবন করা ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছে। কারণ বিভিন্ন শস্য চাষের ক্ষেত্রে বেশি বেশি করে কৃষির যন্ত্রীকরণ ঘটছে। কৃষিকাজ ক্রমাগত বিশেষীকৃত (স্পেশালাইজড্) হয়ে উঠছে বা বিশেষীকৃত দক্ষতা (Skill) নির্ভর হচ্ছে। কৃষক পরিবারগুলির মধ্যে পেশাগত বিভিন্নতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এর ফলেও ধনী কৃষক ও দরিদ্র কৃষকের মধ্যে বৈষম্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ধনী কৃষকদের হাতে রয়েছে উন্নত মানের কৃষি উপকরণগুলি, বিশেষ করে উন্নত মানের জমি ও অন্যান্য উৎপাদনমূলক সম্পদগুলি। অন্যদিকে দরিদ্র কৃষকের আছে অতি সামান্য সম্পদ, হয়তো সামান্য কিছু জমি। ধনী কৃষকরা তুলনামূলকভাবে প্রচুর বিনিয়োগের কারণে জমি থেকে বেশি লাভ করছে। নানা প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক সামাজিক কারণে দরিদ্র কৃষক অনেক সময় চাষের উৎপাদন খরচটুকুও তুলতে পারছে না। কৃষিতে পুঁজির প্রবেশ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। অসম প্রতিযোগিতায় এক বড় অংশে কৃষকের অস্তিত্ব সংকটজনক হয়ে উঠেছে। কৃষক আত্মহত্যার মতো ঘটনা অনেক বেশি

করে শোনা যাচ্ছে। অনিশ্চয়তার দরুন পেশা হিসেবে কৃষিকাজ ছেড়ে দেবার ঘটনা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। একে বলা হচ্ছে বি-কৃষকায়ন বা ডি-পিজেন্টাইজেশন (de-peasantisation)।

কৃষিতে পুঁজিবাদের প্রবেশ যত বৃদ্ধি পাচ্ছে, গরীব কৃষকের অস্তিত্ব ততই সঙ্কটজনক হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে বিভিন্ন ইস্যুতে কৃষক আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছে, তার তীব্রতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক নীতি রূপায়ণের ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষক বিদ্রোহ এবং আন্দোলনের সূত্রপাত হতে দেখা যায়। কৃষকদের স্থানীয় দাবি-দাওয়ার আন্দোলনও কখনো কখনো জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হতে দেখা যায়। স্বাধীনতা-পরবর্তী কালেও নানা পর্যায়ে বিভিন্ন ইস্যুতে আঞ্চলিক ও জাতীয় স্তরে ছোট-বড় অনেক কৃষক বিক্ষোভ ও আন্দোলন সংঘটিত হতে দেখা যায়।

স্বাধীনতা-পূর্ব ভারতে কৃষক আন্দোলন
(Peasant Movements in Pre-Independence India)

'ভারতবর্ষের কৃষক আন্দোলন' সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে অধ্যাপক এ. আর. দেশাইয়ের দুটি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। একটি মূলত স্বাধীনতা-পূর্ব ব্রিটিশ-শাসিত ভারতের কৃষক আন্দোলন নিয়ে তাঁর সম্পাদিত 'পিজান্ট স্ট্রাগলস্ ইন ইন্ডিয়া (১৯৭৯)। অন্য গ্রন্থটিতেও তিনি পঁচিশটি প্রবন্ধের সম্পাদনা করেন। স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতের কৃষক আন্দোলনের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে বিস্তারিত উপস্থাপনা 'অ্যাগ্রেরিয়ান স্ট্রাগলস্ ইন ইন্ডিয়া আফটার ইনডিপেন্ডেন্স' (১৯৮৬) নামের এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের ভূমিকায় অধ্যাপক দেশাই কেন-এর নাম 'পিজান্ট স্টাগলস্'-এর পরিবর্তে 'অ্যাগ্রারিয়ান স্ট্রাগলস্' দিয়েছেন সে বিষয়টি বুঝিয়ে বলেছেন। ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষে কিছু উল্লেখযোগ্য কৃষক সংগ্রাম সংঘটিত হয়েছিল রাজার শাসনাধীন রাজ্যে, আবার কিছু ঘটেছিল বর্তমানের পাকিস্তানভুক্ত অঞ্চলে কিংবা অধুনা বাংলাদেশে। দেশভাগের পর ভারতের মানচিত্র ব্রিটিশ শাসনের সময়কালের থেকে পরিবর্তিত হয়ে যায়, রাজার শাসনাধীন বা স্বশাসিত উপজাতি অঞ্চলগুলিরও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না।

অধ্যাপক এ. আর. দেশাই-এর মতে, ব্রিটিশ শাসিত ভারতে রায়তওয়ারী অঞ্চলে ব্রিটিশ শাসকদের ভূমিরাজস্ব নীতির বিরুদ্ধে ধনী ও মধ্য কৃষক সহ সমগ্র কৃষকসমাজ সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিল। ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে জমিদারী অঞ্চলে কৃষক আন্দোলন সংগঠিত করেছিল মূলত প্রজা ও উপপ্রজারা অর্থাৎ সরাসরি চাষাবাদের সাথে যুক্ত মানুষেরা। অধ্যাপক দেশাই-এর মতে, বিভিন্ন উপজাতি অঞ্চলে প্রতিরোধের

বিভিন্ন ধরণ ও কৌশল অবলম্বন করে কৃষক সংগ্রাম গড়ে উঠেছিল। কখনো কৃষক সংগ্রাম গড়ে উঠেছে ব্রিটিশ শাসকের অরণ্য-নীতির বিরুদ্ধে, অরণ্য ধ্বংসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ তৈরি হয়েছে। উত্তর-পূর্ব পার্বত্য অঞ্চলের নৃকুলগোষ্ঠী আন্দোলনগুলি ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে জঙ্গী আকার ধারণ করেছে।

ক্যাথলিন গফ্-এর মতে, ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষে উত্তর-পূর্ব পার্বত্য অঞ্চলে উপজাতি নৃকুল (ethnic) গোষ্ঠীগুলির প্রতি অত্যাচার ও শোষণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। অরণ্য অঞ্চল জবরদখল, মাত্রাতিরিক্ত কর, সমতলের বণিক-মহাজনদের সুদের কারবার, বেগার খাটা, ইত্যাদি নানা ধরনের অত্যাচার ও শোষণের মুখে পড়তে হয় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষদের। আর বিনা মজুরীতে বাধ্যতামূলকভাবে তাদের বাণিজ্যিক শস্য উৎপাদনে অংশগ্রহণ করাতে প্রয়োজনে বলপ্রয়োগ করা হয়।

এসব কারণেই পার্বত্য উপজাতি গোষ্ঠীগুলি জঙ্গী প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলে। ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে ছোট-বড় বহু উল্লেখযোগ্য কৃষক সংগ্রাম ও আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে। অনেকের মতে, ভারতবর্ষের কৃষকরা অদৃষ্টবাদী, পরজন্মে বিশ্বাসী এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন। সেই কারণে তারা অন্যান্য দেশের কৃষকদের তুলনায় দুর্বল এবং প্রতিরোধক্ষমতাহীন। অধ্যাপক এ. আর. দেশাই, ক্যাথলিন গফ্ প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানীরা এই ধরনের মতামতকে অবান্তর ও যুক্তিহীন বলেছেন। ব্রিটিশ আমলে সংঘটিত গুরুত্বপূর্ণ কৃষক আন্দোলনগুলি ভারতীয় কৃষকদের শক্তি, সাহস এবং প্রতিরোধ ক্ষমতাকেই প্রমাণ করে।

১৮৫৮ সাল থেকে শুরু করে ১৯১৪ সাল অবধি ভারতে কৃষক আন্দোলগুলি গড়ে উঠেছে স্থানীয়ভাবে। এগুলি ছিল বিচ্ছিন্ন প্রকৃতির এবং নির্দিষ্ট অসন্তোষ ও অভিযোগের মধ্যেই এগুলি আবর্তিত ছিল। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ১৮৫৯-৬২ বাংলার নীলবিদ্রোহ (Revolt against Indigo Plantation)।

নীলবিদ্রোহ (Indigo Rebellion) : নীল চাষ ভারতে সনাতন কৃষিকাজের অংশ ছিল না। নীলকর সাহেবরা তাদের ঔপনিবেশিক স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে অবিভক্ত বাংলার এক অংশের কৃষককে নীল চাষে বাধ্য করে। নদীয়া, মালদা, দিনাজপুর, রাজশাহী, পাবনা, প্রভৃতি অঞ্চলের কৃষকরা জোর করে নীল চাষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করে। নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধও শুরু হয়। নীলকুঠিগুলি নীল চাষীদের আক্রমণের লক্ষ্যে পরিণত হয়।

নীলবিদ্রোহের তীব্রতা দেখে ব্রিটিশ শাসকরা ১৮৬০ সালে নীল কমিশন গঠন করে। এই কমিশন তদন্ত করে রিপোর্ট প্রকাশ করে। তাতে জোর করে চাষীদের দিয়ে নীলচাষ করার বিষয়টিকে অনৈতিক, বেআইনী ও ভ্রান্ত আখ্যা দেওয়া হয়। কমিশনের

রিপোর্টের ফলশ্রুতিতে নীল চাষ সংক্রান্ত একটি আইন পাশ হয়। তাতে বলা হয়, চাষীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে নীল চাষে বাধ্য করা যাবে না। স্বতঃস্ফূর্ত নীল বিদ্রোহ সাফল্য লাভ করে।

দক্ষিণাপথের দাঙ্গা বা ডেকান রায়টস (Deccan Riots) : ১৮৭৫ সালের মে-জুন মাসে পুনে, সাতারা এবং আহমেদনগর—মহারাষ্ট্রের এই তিন জেলায় দরিদ্র কৃষকরা চরম দুর্দশার কারণে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই বিদ্রোহ ছিল মূলত ঐ অঞ্চলের মহাজনদের চরম আর্থিক শোষণের বিরুদ্ধে। এর মূল লক্ষ্য ছিল মহাজনদের কাছে গচ্ছিত ঋণসংক্রান্ত কাগজপত্র ফেরৎ পাওয়া এবং কৃষক স্বার্থবিরোধী বন্ড, ডিক্রি ইত্যাদি ধ্বংস করা।

ব্রিটিশ-শাসিত ভারতে ঔপনিবেশিক স্বার্থে পরিচালিত কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ (commercialization of agriculture) ভারতীয় গ্রামীণ সমাজে মহাজন শ্রেণির উদ্ভব ঘটায়। চড়া সুদে গরীব কৃষকদের ঋণ, ছলে-বলে-কৌশলে গরীব কৃষকদের বন্ধক দেওয়া জমি আত্মসাৎ—এই সবই কৃষক অসন্তোষ চরম পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল। এর সাথে ছিল কৃষকদের অভাবী বিক্রি, উৎপাদিত কৃষি দ্রব্যের মূল্য হ্রাস, ক্রমবর্ধমান রাজস্ব-এরই মিলিত প্রভাব দরিদ্র কৃষকদের মরা-বাঁচার প্রান্তসীমায় নিক্ষেপ করেছিল।

মহাজনদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ-বিদ্রোহ ক্রমে ব্রিটিশ বিরোধী বিক্ষোভ-বিদ্রোহে রূপান্তরিত হয়েছিল। ১৮৭৯ সালে এই অঞ্চলে বাসুদেও বলবন্ত ফাড়কে-র নেতৃত্বে ব্রিটিশ শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে জঙ্গী আন্দোলন শুরু হয়। যদিও এই আন্দোলন খুব বেশি সাফল্য লাভ করতে পারেনি। আন্দোলনকারীদের মধ্যে কেউ ব্রিটিশ প্রশাসকদের প্রলোভনে ফাড়কের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। ফাড়কে ব্রিটিশদের হাতে বন্দী হন। জেলে অনশন করে ১৮৮৩ সালে তিনি শহীদের মৃত্যু বরণ করেন।

সাঁওতাল বিদ্রোহ (Santhal Rebellion) : স্বাধীনতা-পূর্ব ভারতের কৃষক আন্দোলনে সাঁওতাল বিদ্রোহ অন্যতম। ১৮৫৫ সালের জুন মাসে বর্তমান ঝাড়খণ্ড অঞ্চলে এই আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ব্রিটিশ আমলে জমিদার, মহাজন ও ব্রিটিশ প্রশাসকদের শোষণ ও অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে আদিবাসী সাঁওতালরা বিদ্রোহ করে। এই আন্দোলন ছিল জঙ্গী প্রকৃতির। এই বিদ্রোহ 'সাঁওতাল হূল' নামেও পরিচিত ছিল। সাঁওতালী ভাষায় 'বিদ্রোহ'-কে 'হূল' বলা হয়।

প্রধানত সিধু মুর্মু ও কানহু মুর্মু এই দুই সহোদর ভাইয়ের নেতৃত্বে এই বিদ্রোহ শুর হয়। দশ হাজার সাঁওতাল কৃষকের সমাবেশ থেকে ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রো ঘোষণা করা হয়। এই অঞ্চলে সমান্তরাল সরকার পরিচালনার কথা বলা হয়। সেই সম এই অঞ্চলকে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি বলা হতো। ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ক

ব্রিটিশ শাসকেরা জমিদারদের রাজস্ব আদায়কারী থেকে জমির মালিকে পরিণত করলো। জমিদাররা উচ্চহারে রাজস্ব আদায় করতে গরীব কৃষকদের উপর বলপ্রয়োগ, জমি থেকে উচ্ছেদ প্রভৃতি নানা ধরনের অত্যাচার করতো। জমিদারদের লেঠেল ছাড়া ব্রিটিশদের পুলিশও এই ব্যাপারে জমিদারদের সহায়তা করতো। এই সবের বিরুদ্ধেই তীব্র বিদ্রোহ ঘোষণা করলো সাঁওতালরা। ব্রিটিশ শাসকদের সহায়তায় জমিদার-মহাজন ব্যবস্থার লাগাম ছাড়া শোষণ-অত্যাচার, দুর্নীতি, দরিদ্র সাঁওতাল কৃষকদের এর বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলনে নামতে বাধ্য করলো।

দশ হাজার সাঁওতাল উপজাতি মানুষের সমাবেশ থেকে বিদ্রোহের কথা ঘোষিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে ষাট হাজার উপজাতি মানুষ ব্রিটিশ শাসক, জমিদার-মহাজনদের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহে যুক্ত হয়। এই আন্দোলন সাময়িক সাফল্যও লাভ করে। ব্রিটিশ প্রশাসন এই বিদ্রোহকে রুখতে সর্ব শক্তি নিয়োগ করে। পনেরো হাজারেরও বেশি বিদ্রোহীকে হত্যা করা হয়। সাঁওতাল আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস করা হয়। সিধু এবং কানহু-কে গ্রেপ্তার করতে পারলে ব্রিটিশ সরকার পুরস্কার হিসেবে দশ হাজার টাকা ঘোষণা করে। সিধু-কানহু গ্রেপ্তার হয়। তাঁদের হত্যা করা হয়। এই দমন-পীড়নে সাঁওতাল বিদ্রোহীরা পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়। তবে সাঁওতাল উপজাতি গোষ্ঠীর গর্বের এবং আত্মমর্যাদার প্রতীক হয়ে থাকে এই সাঁওতাল বিদ্রোহ।

চম্পারণ আন্দোলন (Champaran Movement) : ১৯১৭ সালে ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে বিহারের চম্পারণ জেলায় এই কৃষক আন্দোলন সংঘটিত হয়। ব্রিটিশরা তাদের বেশি মুনাফার স্বার্থে অঞ্চলের কৃষকদের নীল চাষে বাধ্য করতো। প্রজাসত্ত্বের অন্যতম শর্ত হিসেবে খুব কম মজুরী কখনো বা মজুরী ছাড়াই কৃষকদের নীল চাষ করতে বাধ্য করা হতো। এই সামান্য আয়ে তাদের বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে পড়েছিল।

গান্ধীজী ১৯১৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে ফেরেন। চম্পারণে কৃষকদের সমস্যা তাঁকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকাকালীন অসাম্য এবং অবিচারের বিরুদ্ধে তিনি গণআন্দোলন গড়ে তুলতে যে পদ্ধতি প্রয়োগ করেছিলেন এখানেও সেই পদ্ধতিই প্রয়োগের কথা ভাবেন। ১৯১৬ সালে গান্ধীজী চম্পারণে যান। গরীব কৃষকদের প্রতি অবিচারের বিরুদ্ধে ঐ অঞ্চলের কৃষকদের সংগঠিত করে সত্যাগ্রহ আন্দোলন গড়ে তোলেন। এটিই ছিল ভারতের ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম সত্যাগ্রহ আন্দোলন। চম্পারণের এই কৃষক আন্দোলনকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। গান্ধীজীর নেতৃত্বে অহিংস পদ্ধতির এই আন্দোলনে হাজার হাজার মানুষের অংশগ্রহণ ব্রিটিশ প্রশাসকে

বিচলিত করে। কৃষকরা নীল চাষ বন্ধ করে দিলেও এ নিয়ে তারা কৃষকদের আর বলপ্রয়োগ করে চাষে বাধ্য করেনি। চম্পারণ কৃষক সত্যাগ্রহ অহিংস পদ্ধতিতে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম মাইল ফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

খেদা কৃষক আন্দোলন (Kheda Peasant Movement) : ১৯১৮ সালে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনকালে গুজরাটের খেদা জেলায় এই আন্দোলন সংঘটিত হয়। চম্পারণ সত্যাগ্রহের পর গান্ধীজীর নেতৃত্বে খেদা অঞ্চলের কৃষকদের এটি আর একটি সত্যাগ্রহ আন্দোলন। গান্ধীজীর সঙ্গে বল্লভভাই প্যাটেলের মতো নেতারাও এই আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। খেদার কৃষকরা সরকারের কাছে একটি দরখাস্তে ঐ অঞ্চলের দুর্ভিক্ষের জন্য কর-ছাড় দেওয়ার আবেদন করেন। খেদা অঞ্চলের সব জাতিগোষ্ঠীই এই আন্দোলনে সামিল হয়। সরকার খেদার কৃষকদের দাবি খারিজ করে দেয়। প্রশাসন কৃষকদের এই বলে সাবধান করে যে তারা কর না দিলে তাদের চাষের জমি বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া হবে এবং কৃষকদের গ্রেপ্তার করা হবে। কৃষকরা তবুও কর না দেওয়ার সিদ্ধান্তে অনড় রইলো। সরকারী রাজস্ব সংগ্রাহকরা পুলিশের সহায়তায় কৃষকের জমি দখল নিতে শুরু করলো, পুলিশ কৃষকদের দলে দলে গ্রেপ্তার করতে থাকলো। কিন্তু কৃষকরা কোনরকম জঙ্গি আন্দোলনের পথে গেল না। তারা বিনা বাধায় গ্রেপ্তারী বরণ করতে থাকলো। গান্ধীজীর পরামর্শে এই আন্দোলন ছিল পুরোপুরি অহিংস এবং সুশৃঙ্খল।

এই আন্দোলনের জনসমর্থন দেখে সরকার কৃষকদের সাথে সমঝোতায় আসে। ঐ বছর এবং পরের বছরের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র কৃষকদের কর মকুব করা হয়। গ্রেপ্তার হওয়া কৃষকদের মুক্তি দেওয়া হয়। কৃষকদের বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়া হয়। কিছুটা হলেও এই আন্দোলনের সাফল্য কৃষকদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করে। অহিংস পথে স্বাধীনতা আন্দোলনের গুরুত্বও এর ফলে বৃদ্ধি পায়।

মোপলা বিদ্রোহ (Moplah Rebellion) : কেরালার মাল্লাপুরম জেলার আরনাদ, পশ্চিম ওয়াল্লুভানাদ, উত্তর পোন্নানি প্রভৃতি প্রধানত মোপলা জনসংখ্যা-অধ্যুষিত অঞ্চল। এই অঞ্চলের ভূস্বামীদের বলা হতো 'জেনমি'। প্রায় সব জেনমিই ছিল হিন্দু—বিশেষত নাম্বুদিরি, রাজা ও মন্দির এবং বেশির ভাগ প্রজা ছিল মোপলা। এই অঞ্চলের বেশির ভাগ কৃষক এই মোপলারা ছিল মুসলিম ধর্মাবলম্বী।

মোপলা কৃষকরা 'জেনমি' বা ভূস্বামীদের নানা ধরনের অত্যাচারের সম্মুখীন হতো। ফসল ঠিকমতো উৎপাদন হোক বা না হোক মোপলা কৃষকদের উঁচু হারে কর দিতে বাধ্য করা হতো। তাদের প্রজাসত্ত্বেরও স্থায়িত্ব ছিল না। কারণে-অকারণে তাদের জমি থেকে উচ্ছেদ করা হতো।

'জেনমি' বা ভূস্বামীদের শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে ১৯২১ সালে কেরলের মালাবার অঞ্চলে মোপলা কৃষকরা জঙ্গি আন্দোলন শুরু করে। 'জেনমি' বা ভূস্বামীদের সমর্থনে ব্রিটিশ শাসকেরা মোপলা প্রজাদের বিদ্রোহ কঠোর হাতে দমন করতে চেষ্টা করে। ফলে মোপলাদের সঙ্গে ব্রিটিশ-প্রশাসন ও পুলিশদের সংঘর্ষ বাধে। মোপলারা হিন্দু ভূস্বামীদের সঙ্গে সঙ্গে সরকারী প্রতিষ্ঠান, থানা ইত্যাদি আক্রমণ করতে থাকে। এই সময় হিন্দু ভূস্বামীদের উপর মোপলাদের ৩৫টি ফৌজদারী হামলার ঘটনা নথিভুক্ত হয়। এসবের ফলে অনেক ব্রিটিশ ঐতিহাসিক এই সিদ্ধান্তে আসেন যে মোপলারা হলো একটি উগ্র জঙ্গি গোষ্ঠী। ব্রিটিশ প্রশাসনও সেইমতো তাদের হাত থেকে 'ভদ্র ও আইন-অনুগত' নাগরিকদের রক্ষা করার জন্য 'মোপলা হাঙ্গামা (প্রতিরোধ) আইন' বলবৎ করে। তবে কারো কারো মতে, এই সময় কিছু স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর লক্ষ্য ছিল প্রজা-কৃষকদের জেনমি বা ভূস্বামী বিরোধী মানসিকতাকে মোপলাদের হিন্দু বিরোধী মানসিকতায় রূপান্তরিত করা। আর এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে অনগ্রসর মোপলারা এই জিগিরের শিকার হয়ে দাঁড়াবে।

বারদোলি কৃষক আন্দোলন (Bardoli Peasant Movement) : বারদোলি কৃষক আন্দোলন শুরু হয় ১৯২৮ সালে, গুজরাটের সুরাট জেলার বারদোলি তালুকে। স্বাধীনতা-পূর্ব ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষে চম্পারণ ও খেদার কৃষক সত্যাগ্রহের সাফল্য অন্যান্য অঞ্চলের গরীব কৃষকদেরও উজ্জীবিত করে। বারদোলি তালুকের গরীব কৃষকেরা গান্ধীজী নির্দেশিত অহিংস পথে অসহযোগিতা ও সত্যাগ্রহের নীতিকে আপন করে নেয়। বারদোলির কৃষকদের মধ্যে অর্ধেকই ছিল খুব গরীব। এরা 'দুবলা' প্রজা নামে পরিচিত ছিল। এদের 'কালিপ্রজা'ও বলা হতো।

১৯২৫-২৬ সালে বারদোলি অঞ্চলে বন্যা হয়। চাষের খুব ক্ষতি হয়। গরীব কৃষকরা আর্থিক বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। এরই মধ্যে অমানবিক বোম্বে প্রেসিডেন্সির ব্রিটিশ প্রশাসকরা কর-ছাড় দেওয়ার বদলে এই অঞ্চলের কৃষকদের কর ২২ থেকে ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি করে। এই অঞ্চলের ভূস্বামীরা ব্রিটিশ প্রশাসকদের পক্ষ অবলম্বন করে। দরিদ্র 'দুবলা' প্রজাদের জীবনে চরম বিপর্যয় ঘনিয়ে আসে। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে এই কৃষকেরা আন্দোলন শুরু করে। এই সময় গান্ধীজী বারদোলিতে আসেন। কৃষকদের সত্যাগ্রহ আন্দোলন উঁচু মাত্রা লাভ করে। এই আন্দোলন সেই সময় চলতে থাকা স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত হয়। প্রথমে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এই অঞ্চলের কৃষকদের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে ঐ বছরের জন্য কর মকুব করার লিখিত আবেদন করেন বোম্বে প্রেসিডেন্সির গভর্ণরের কাছে। গভর্ণর সেই আবেদন খারিজ করে দিয়ে উল্টে কর সংগ্রহের দিন ঘোষণা করেন। বারদোলি অঞ্চলের কৃষকদের সভা

থেকে খাজনা বন্ধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সর্দার প্যাটেল বারদোলি তালুককে তিনটি শিবিরে ভাগ করে পারিখ, ভ্যাস, পাণ্ডিয়া প্রমুখ নেতাদের অঞ্চলগুলির আন্দোলন পরিচালনার দায়িত্ব দেন। সুশৃঙ্খলভাবে অহিংস পথে পরিচালিত এই আন্দোলন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই সময় সাইমন কমিশনের ভারতে আসার কথা। জাতীয় কংগ্রেস সারা ভারতব্যাপী সাইমন কমিশন বয়কটের কথা ঘোষণা করে। জাতীয় পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে বারদোলি কৃষক আন্দোলনের প্রতি ব্রিটিশ সরকার নরম অবস্থান গ্রহণ করে। সর্দার প্যাটেলের সাথে তারা যোগাযোগ করে। তাঁর দাবি মতো কৃষকদের খাজনা অনেকটা কমানো হয়। বন্দী সত্যাগ্রহীদের মুক্তি দেওয়া হয়। বাজেয়াপ্ত জমি ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

বারদোলির কৃষক-সত্যাগ্রহ শুধু দেশের কৃষক আন্দোলনকেই নয়, জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামকেও শক্তিশালী করেছিল।

তেভাগা আন্দোলন (Tebhaga Movement) : ভারতের স্বাধীনতা লাভের ঠিক আগে ১৯৪৬ সালে অবিভক্ত বাংলার কৃষকদের সবচেয়ে বড় আন্দোলন হলো তেভাগা আন্দোলন। সেই সময় বড় বড় জমির মালিক ছিল জোতদাররা। তারা নিজেরা তাদের সমস্ত জমি চাষ করে উঠতে পারতো না। তারা ভূমিহীন বা খুব অল্প জমির মালিক কৃষকদের দিয়ে জমি চাষ করাতো। এদের বলা হতো ভাগচাষী বা বর্গাদার। বর্গা জমিতে তাদের কোনোরকম অধিকার ছিল না। জোতদারদের সাথে কোনো লিখিত চুক্তিও থাকতো না। জোতদাররা ইচ্ছে করলেই বর্গাদার পাল্টাতে পারতো। প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী, উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক অংশ বর্গাদার বা ভাগচাষীদের জোতদার বা জমির মালিকদের দিতে হতো। ১৯৪৬ সালের দ্বিতীয়ার্ধে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার নেতৃত্বে বর্গাদাররা আন্দোলন শুরু করে। বর্গাদাররা ছিল সবচেয়ে শোষিত ও নিপীড়িত কৃষক। জোতদারদের থেকে সামান্য যেটুকু পেত তা নিয়ে তাদের সংসার চালানো অসম্ভব হয়ে পড়তো। অবিভক্ত বাংলার প্রায় ৬০ লাখ ভাগচাষী ধর্ম-জাতি-লিঙ্গ নির্বিশেষে চরমপন্থী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তাদের দাবী ছিল তাদের উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক নয়, তিন ভাগের এক ভাগ তারা জমির মালিককে দেবে। ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ তাদের কাছে থাকবে। এটাই তেভাগা নামের উৎস। অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই এই আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করলো। আন্দোলনের ব্যাপ্তি ছিল অবিভক্ত বাংলা জুড়ে। উত্তর বাংলার দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, বর্দ্ধমান, হুগলী, মেদিনীপুর, চব্বিশ পরগণা, অধুনা বাংলাদেশের রংপুর, পাবনা, যশোর প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। ভাগচাষী-বর্গাদারদের স্লোগান ছিল—'আধি নয়, তেভাগা চাই'। এই আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে ১৯৪৭ -এর ২২শে জানুয়ারি 'বেঙ্গল বর্গাদারস্

টেম্পোরারি রেগুলেশন বিল' চালু হয়। বাস্তবে, বৈপ্লবিক ভাগচাষী আন্দোলনের জোয়ারকে স্তিমিত করার উদ্দেশ্যে এই বিল পাশ হলেও তাতে এই আন্দোলনের দাবিগুলিকেই স্বীকার করা হয়। অনেক সমাজবিজ্ঞানী এই আন্দোলন বিশ্লেষণ করে মত প্রকাশ করেছেন যে এর ফলে ভূমির মালিকানা ও রাজস্ব সংক্রান্ত কর্তৃত্বগুলি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছিল।

তেলেঙ্গানা আন্দোলন (Telengana Movement) : ভারত স্বাধীন হওয়ার আগে ব্রিটিশ সরকারের অধীন থাকলেও হায়দ্রাবাদ শাসন করতো নিজাম। হায়দ্রাবাদ তিনটি ভাষাভিত্তিক অঞ্চলকে নিয়ে গড়ে উঠেছিল—তেলেঙ্গানা অঞ্চলের অধিবাসীরা তেলেগু ভাষায় কথা বলতো, মারাঠওয়ার অঞ্চলে ছিল মারাঠীভাষী মানুষদের বসবাস আর একটা ছোট অঞ্চল ছিল সেখানকার অধিবাসীরা কানাড়া ভাষায় কথা বলতো। এই অঞ্চলগুলির জমির মালিকানার ধরণ ছিল চরম শোষণমূলক। অধিকাংশ উর্বর জমির মালিকানা ছিল সরাসরি নিজাম কিংবা তাদের ঠিক করা জায়গীরদারদের হাতে। যারা প্রকৃত জমি চাষ করতো সেই গরীব কৃষকদের চাষের জমিতে কোনো রকম আইনী অধিকার ছিল না। জমির মালিকরা যখন তখন তাদের জমি থেকে উচ্ছেদ করতে পারতো। এই অঞ্চলে চরম শোষণমূলক 'ভেত্তি' (Vetti) ব্যবস্থা চালু ছিল। এই ব্যবস্থা অনুসারে 'নীচু' জাতভুক্ত কৃষকদের বাধ্যতামূলকভাবে জমিদাররা মর্জিমাফিক বিভিন্ন ধরনের কাজ করাতে পারতো। এই পরিবারগুলি প্রতিদিন জমিদারবাড়িতে কোনো একজনকে পাঠাতে বাধ্য থাকতো এইসব কাজ করতে।

১৯৩৪ সালে অন্ধ্র মহাসভা নামের একটি সংগঠন বিভিন্ন ধরনের শোষণ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে গরীব কৃষকদের সংগঠিত করতে শুরু করে। তারা 'ভেত্তি' প্রথার অবসান দাবি করে, জমি-রাজস্ব হ্রাস করা, প্রয়োজনে মকুব করার দাবি করে। ১৯৪২ সালে কমিউনিষ্ট পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার পর অন্ধ্রমহাসভার আন্দোলনে দ্রুত কমিউনিষ্ট পার্টির প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। তারা সংঘম্ (village-level committee) গঠন করে দ্রুততা এবং সাফল্যের সঙ্গে তেলেঙ্গানা অঞ্চলের গরীব কৃষক, ক্ষেতমজুর, দরিদ্র প্রজা ইত্যাদিকে সংগঠিত করতে শুরু করে।

১৯৪৬ সালের ৪ জুলাই জমিদারদের হিংসা ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কৃষকরা বিরাট মিছিল বার করে। মিছিল জমিদার বাড়ির কাছে পৌঁছতেই জমিদার আশ্রিত গুণ্ডারা মিছিল লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করে। গুলিতে দোদ্দি কোমরাইয়া (Doddi Komarayya) নামে এক সংঘম্ নেতার মৃত্যু হয়। আশপাশের গ্রামগুলিতে এই খবর ছড়িয়ে পড়ে। উত্তেজিত গ্রামবাসীরা জমিদার বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। কোমারাইয়ার মৃত্যু তেলেঙ্গানার কৃষকদের বিক্ষুব্ধ করে তোলে। তারা বিদ্রোহ ঘোষণা

করে। 'ভেট্টি'-র বিরুদ্ধে, জমি থেকে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে, জমিদারদের অত্যাচার-সন্ত্রাস এর বিরুদ্ধে তারা তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। আশপাশের তিনটি জেলার ৩০০-৪০০ গ্রামের কৃষকরাও এই বিক্ষোভ আন্দোলনে যোগ দেয়। অনেক জমিদার এবং সরকারী আধিকারিক কৃষক বিদ্রোহের ভয়ে গ্রাম ত্যাগ করে। কৃষকদের হাতে অস্ত্র হিসেবে ছিল লাঠি আর পাথর। ১৯৪৬-এর অক্টোবর মাসে নিজাম সরকার অন্ধ্র মহাসভাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। মার্শাল ল' জারি হয়। সৈন্য নামানো হয়। সরকারের সঙ্গে কৃষকদের সংঘর্ষ রক্তক্ষয়ী হয়ে ওঠে। এত অত্যাচারের মধ্যেও তেলেঙ্গানার কৃষকদের আন্দোলন সাফল্য পেতে থাকে।

১৯৪৭-এর আগস্টে ভারত স্বাধীন হলেও হায়দ্রাবাদ নিজাম-শাসিত রাজ্য হিসেবেই থেকে যায়। এই সময় রাজাকারদের পাঠানো হয় কৃষক বিদ্রোহ দমন করতে। তেলেঙ্গানা অঞ্চলে নিজাম প্রশাসন সীমাহীন অত্যাচার শুরু করে (ধানগারে, ১৯৮৩)। কম্যুনিষ্ট প্রভাবিত অন্ধ্রমহাসভা এই সময় তাদের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলগুলিতে 'গ্রাম-রাজ্যম' নামে সমান্তরাল সরকার গঠন করে। প্রায় চার হাজার গ্রামে সমান্তরাল সরকার গঠিত হয়। 'গ্রাম-রাজ্যম' ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের মধ্যে চাষের জমি বিলি শুরু করে। জমি থেকে উচ্ছেদ হওয়া চাষিরা জমি ফিরে পায়। এইসব কর্মসূচি এই আন্দোলনকে আশপাশের অঞ্চলের কৃষকদের কাছে আরও জনপ্রিয় করে তোলে।

১৯৪৮ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর তেলেঙ্গানা অঞ্চলকে সন্ত্রাসমুক্ত করতে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী হায়দ্রাবাদ রাজ্যে প্রবেশ করে। এক সপ্তাহের মধ্যেই নিজাম তার রাজাকার বাহিনী ও পুলিশবাহিনী সহ ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। ভারতীয় সৈন্যরা বিদ্রোহী কৃষক ও গেরিলা বাহিনীকেও দমন করতে পদক্ষেপ করে। পরের তিন বছরের মধ্যে হাজার হাজার বিদ্রোহী গ্রেপ্তার হয় (ধানাগারে, ১৯৮৩)। পাশাপাশি, কৃষকসমাজের সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে সদ্য স্বাধীন ভারত সরকার ১৯৪৯ সালের আগষ্ট মাসে 'জায়গীর অ্যাবোলিশন রেগুলেশন' চালু করে। সার্বিক ভূমিসংস্কারের সুপারিশ করার জন্য একটি কমিশনও গঠন করা হয়। ১৯৫১ সালের ২১ অক্টোবর তেলেঙ্গানা আন্দোলনের সংগঠকরা এই আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করে।

যদিও তেলেঙ্গানা আন্দোলনের যথার্থ মূল্য ও প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে সমাজবিজ্ঞানী মহলে যথেষ্ট বিতর্ক আছে, তবে সদ্য স্বাধীন একটি দেশে কৃষি ও কৃষক স্বার্থের প্রশ্নটিকে সামনে তুলে ধরার ক্ষেত্রে এই আন্দোলনের ভূমিকা সকলেই স্বীকার করেন।

স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতে কৃষক আন্দোলন (Peasant Movements in Post-Independence India) : স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতে কৃষক আন্দোলন মূলত কৃষিজমির মালিকানা ও কৃষিজমির সুষম বণ্টনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। এক্ষেত্রে

'পিজ্যান্ট' বা কৃষক বলতে প্রজা, ভাগচাষী বা বর্গাদার, ক্ষুদ্র চাষী, ক্ষেতমজুর এবং ভূমিহীন ক্ষেতমজুর—এদের সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। স্বাধীন ভারতবর্ষ শান্তিপূর্ণ, জঙ্গি বা চরমপন্থী বিভিন্ন ধরনের গুরুত্বপূর্ণ কৃষক আন্দোলন প্রত্যক্ষ করেছে। উৎপাদিত শস্যের উপর অত্যধিক মাত্রায় কৃষি-কর, উঁচু হারে রাজস্ব-এর বিরোধিতায় কিংবা জমির ন্যায্য পূর্ণ বণ্টনের দাবিতে বিভিন্ন রাজ্যে কৃষক আন্দোলন গড়ে উঠেছে। ধনী কৃষকদের শোষণ ও অত্যাচারের প্রতিবাদে গরীব কৃষকরা সংগঠিত হয়েছে, প্রতিবাদে আন্দোলন গড়ে তুলেছে। জমিদারী উচ্ছেদ আইনকে ফাঁকি দিয়ে জমিদাররা নামে-বেনামে জমির মালিকানা ধরে রেখেছে। উদ্বৃত্ত জমি আশানুরূপভাবে চিহ্নিত হয়নি। এর প্রতিবাদে সংগঠিত কৃষক আন্দোলনে দাবি উঠেছে-'লাঙ্গল যার জমি তার'।

পাঞ্জাবের উন্নয়ন-কর বিরোধী কৃষক আন্দোলন : স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে উন্নয়ন-করের বিরুদ্ধে কৃষক আন্দোলন খুবই উল্লেখযোগ্য। তেলেঙ্গানার স্বাধীনতা-পূর্ব এবং স্বাধীনতা-পরবর্তী সময় জুড়ে সংঘটিত কৃষক আন্দোলনের পর স্বাধীনতা-উত্তরকালে এটিই হলো সবচেয়ে বড় আন্দোলন। এই আন্দোলনে কৃষকদের মধ্যে ব্যাপকতম ঐক্য গড়ে উঠেছিল। হিন্দু-শিখ, নারী-পুরুষ আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল। লক্ষ লক্ষ কৃষক এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। এই শান্তিপূর্ণ আন্দোলন ছিল ক্ষুদ্র কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের সীমাহীন অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ।

ভাকরা ক্যানেল কাটার সম্পূর্ণ খরচ তুলে নিতে ১৯৫২ সালে তৎকালীন পাঞ্জাব সরকার কৃষকদের উপর উন্নয়ন-কর চাপিয়ে আইন পাস করে। ক্যানাল কাটার কাজ তখনও পুরোপুরি শেষ হয়নি। সরকারের উদ্দেশ্য ছিল ভাকরা ক্যানেল ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত ৪৯ লক্ষ একর জমি থেকে ১২৩ কোটি টাকা উন্নয়ন-কর বাবদ আদায় করা। গরীব কৃষকদের বক্তব্য ছিল এত উঁচু হারে কর দিতে হলে তাঁদের বাধ্য হয়ে জমি বিক্রি করে দিতে হবে। ১৯৫৭ সালে জমি পিছু করের পরিমাণ হিসেব করে সরকারী ঘোষণা করা হলে কৃষকরা বিক্ষুব্ধ হলো। কর ধার্যের হুকুমনামার বিরুদ্ধে ১১ হাজারেরও বেশি কৃষক আদালতে মামলা করে। ১৯৫৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কর বাতিলের দাবিতে কৃষকরা সর্বদলীয় কমিটির নেতৃত্বে রাজ্য জুড়ে বিক্ষোভ সমাবেশ করে। উন্নয়ন-কর বাতিলের দাবিতে প্রতিবাদ আন্দোলনের তীব্রতা বাড়লো। সরকার এই প্রতিবাদ আন্দোলনের মুখে কিছুটা হলেও পিছু হটলো। সরকার উন্নয়ন-করের হার অনেকটাই কমিয়ে দিল এবং করের বিষয়টি সামগ্রিকভাবে খতিয়ে দেখার জন্য একটি কমিটি গঠন করলো। সরকার ঘোষণা করলো আদায়ীকৃত করের অর্ধেক অংশ ভাকরা-নাঙ্গাল প্রকল্পেই খরচ করা হবে। আন্দোলনের ফলে উন্নয়ন-কর ১২৩ কোটি টাকা থেকে কমে ৩৩ কোটি টাকা হলো।

নকশালবাড়ি কৃষক আন্দোলন : ১৯৬৭ সালের মার্চ মাসে নকশালবাড়ি কৃষক আন্দোলন শুরু হয়। এটি ছিল এক চরমপন্থী কৃষক আন্দোলন। পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি মহকুমার নকশালবাড়ি ব্লকে এই আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। এই কারণে একে 'নকশালবাড়ি আন্দোলন' বলা হয়। নকশালবাড়ি ছাড়াও অচিরেই এই আন্দোলন আদিবাসী অধ্যুষিত ফাঁসিদেওয়া এবং খড়িবাড়ি থানা অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে।

স্থানীয় আদিবাসী কৃষকরা কিছু চরমপন্থীর নেতৃত্বে এই আন্দোলন শুরু করে। চারু মজুমদার, কানু সান্যাল, জঙ্গল সাঁওতাল প্রমুখ ছিলেন এই আন্দোলনের পুরোধা। শুধুমাত্র জোতদার বা জমিদার নয়, সশস্ত্র পথে রাষ্ট্রশক্তির মোকাবিলা করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা—এই ছিল নকশালবাড়ি কৃষক আন্দোলনের ধারণাগত ভিত্তি। গেরিলা পদ্ধতি অবলম্বন করে এই চরমপন্থী আন্দোলনকারীরা তাদের 'শ্রেণিশত্রু'-দের হত্যা করা শুরু করে।

জোতদার-মহাজনদের সীমাহীন শোষণ ও নির্যাতন এই অঞ্চলের কৃষকদের বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। উৎপাদিত ফসলের সিংহভাগটাই জোতদার নিয়ে নিত। গরীব কৃষকদের চাষ করার সুযোগ, উৎপাদিত শস্যের ভাগ—এসবই জোতদারের মর্জির উপর নির্ভর করতো। চরম দারিদ্র্যের কারণে কৃষকদের উৎপাদিত শস্যের 'অভাবী' বিক্রির (distress sale) সুযোগ নিত মহাজন ফড়েরা। চড়া সুদের ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে বন্ধকী জমি, বসতবাড়ি, যেটুকু সম্পত্তি আছে—সবই দখল নিত মহাজনরা। প্রজা চাষী এবং ভূমিহীন কৃষকদের জোতদারের জমিতে এবং বাড়িতে 'বেগার' খাটতে হতো।

সশস্ত্র সংগ্রামই এই ভয়াবহ অবস্থা থেকে মুক্তির একমাত্র পথ—বিক্ষুব্ধ কৃষকদের মধ্যে সেই বিষয়ে প্রচার শুরু করলো বিপ্লবী নেতারা। এই প্রচার গরীব কৃষকদের সাহসী এবং সংগঠিত করে তোলে। সুমন্ত ব্যানার্জি তাঁর 'নকশালবাড়ি অ্যান্ড দি লেফট মুভমেন্ট' নামক প্রবন্ধে এই প্রসঙ্গে বিপ্লবী নেতা কানু সান্যালের বক্তব্য উল্লেখ করেছেন। কানু সান্যালের দাবি অনুযায়ী ১৯৬৭ সালের মার্চ থেকে এপ্রিল মাসের মধ্যে এই অঞ্চলের সমস্ত গ্রামবাসী সংগঠিত হয়েছিল। ১৫ থেকে ২০ হাজার কৃষক পুরো সময়ের সক্রিয় কর্মী হিসেবে নাম লিখিয়েছিল। প্রত্যেকটি গ্রামে কৃষক কমিটি গঠন করা হয়েছিল। এই কমিটিগুলি সশস্ত্র রক্ষী বাহিনীতে পর্যবসিত হয়েছিল। এরা অনতিবিলম্বে কৃষক কমিটির নামে জোতদারদের দখল করা জমিগুলি অধিগ্রহণ করতে শুরু করে। কৃষকদের প্রতারণা করার উদ্দেশ্যে তৈরি করা জমি সংক্রান্ত ভুয়ো নথিপত্র পুড়িয়ে ফেলে। জোতদার নির্ধারিত কৃষকদের সব ধরণের 'ঋণ' বাতিল করে। দমন-পীড়নকারী

জমি-মালিকদের মৃত্যু পরোয়ানা জারি করে। জোতদার-জমিদারদের অস্ত্রশস্ত্র লুঠ করে সশস্ত্র দল গঠন করে। তীর-ধনুক, বর্শার মতো প্রচলিত অস্ত্র দিয়ে নিজেদের সশস্ত্র করে তোলে। এইভাবে গ্রামগুলি দেখাশোনার উদ্দেশ্যে সমান্তরাল প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলে। (ঘনশ্যাম শাহ, সম্পা : ২০০২)

পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলায় এবং ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও নকশালবাড়ি কৃষক আন্দোলনের প্রভাব পড়তে শুরু করে। পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলায় আদিবাসী কৃষক অধ্যুষিত ডেবরা ও গোপীবল্লভপুরে এই আন্দোলনের প্রভাবে কৃষক আন্দোলন শুরু হতে দেখা যায়। অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীকাকুলামেও আদিবাসী কৃষকদের গেরিলাবাহিনী রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াই শুরু করে।

নকশালবাড়ি কৃষক আন্দোলনকে ভিত্তি করে ভারতে সত্তরের দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করার ডাক দিলেন চারু মজুমদার। তাঁর নেতৃত্বে সারা ভারত কো-অর্ডিনেশন কমিটি গড়ে উঠল। তিনি দ্রুত একটি 'বিপ্লবী' কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার ডাক দিলেন। 'বিপ্লবী'-দের আলাদা আলাদা সব গ্রুপকে ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হলো। ১৯৬৯ সালের ১লা মে মে দিবসের সভায় ২২শে এপ্রিল, ১৯৬৯-এ আন্দোলন পরিচালনার জন্য 'ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) বা সি পি আই (এম-এল) গঠন করা হয়ে গেছে বলে কানু সান্যাল ঘোষণা করেন। কৃষি প্রধান দেশ চিনে যে পথে বিপ্লব সম্ভব হয়েছিল, সে পথ অনুসরণ করেই ভারতে 'বিপ্লব' সংগঠিত হবে বলে ঘোষণা করা হলো। ছাত্র-যুবদের গ্রামে গ্রামে গিয়ে 'কৃষি-বিপ্লব'-কে সফল করে তুলবার নির্দেশ দিলেন নবগঠিত দলের সাধারণ সম্পাদক চারু মজুমদার। তাঁর নির্দেশ মতো, সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জোতদার এবং অন্যান্য 'শ্রেণি-শত্রু' বিনাশ করাই হবে 'কৃষি-বিপ্লব'-কে সফল করার পথ।

নকশালবাড়ি আন্দোলন দমনে পুলিশ-প্রশাসন সক্রিয় হয়ে ওঠে। বহু আন্দোলনকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ-নকশাল সংঘর্ষে উভয় পক্ষের বহু মানুষ হতাহত হয়। নকশালবাড়ি কৃষক আন্দোলন তেমন উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জনে ব্যর্থ হয়। কোনো কোনো সমাজবিজ্ঞানীর মতে, ক্রমশ এই আন্দোলনটির চরিত্রগত পরিবর্তন ঘটেছিল। জমির মালিকানা সংক্রান্ত কিংবা উৎপাদিত ফসলে অধিকার সংক্রান্ত দাবি-দাওয়ার পরিবর্তে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল এর মূল লক্ষ্য হয়ে ওঠে। তার ফলে, কৃষকদের হাতে এই আন্দোলনের নিয়ন্ত্রণ থাকে না। আবাদী জমি থেকে প্রজা কৃষকের অপসারণকে কেন্দ্র করে এর সূত্রপাত। এর প্রতিবাদে ঐ অঞ্চলের কৃষকরা জমিদারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। সংগঠিত 'বিপ্লবী' কমিউনিষ্ট নেতৃত্বের পরিচালনায় ত রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের চরমপন্থী আন্দোলনের বৃহত্তর পরিসরে প্রবেশ করে। কারো কারে

মতে, আপাতদৃষ্টিতে অসফল এই কৃষক আন্দোলন কৃষি শ্রমিক ও ভাগচাষিদের রাজনৈতিক চেতনা উন্মেষে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

কৃষক সমাজ ও কৃষক আন্দোলন-সাম্প্রতিক প্রবণতা : ১৯৯১-এর পর ভারতে উদারীকরণের যুগে রাসায়নিক সার, উচ্চ ফলনশীল বীজ ও শস্য-রক্ষক রাসায়নিক-এর মতো উপাদানগুলির সরবরাহের মাধ্যমে কৃষিতে দেশি-বিদেশী বৃহৎ কর্পোরেশনগুলির ভূমিকা বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতীয় কৃষি এখন আন্তর্জাতিক বাজারের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। বহু ধরনের কৃষি-পণ্যের উপর থেকে আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহৃত হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে গম ও গমজাত পণ্য, চাল, বিভিন্ন ডাল, ভোজ্য তেল, বিভিন্ন শস্য, বীজ, ইত্যাদি। অনেক শস্যের ওপর থেকে আমদানি শুল্ক প্রত্যাহৃত হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে মধ্য ও গরীব কৃষকদের টিকে থাকাই খুব কঠিন। সরকার কৃষকদের রক্ষা করার লক্ষ্যে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ঘোষণা করলেও পরিস্থিতির খুব কিছু পরিবর্তন করা সম্ভব হচ্ছে না। আবার অনেক ক্ষেত্রে সরকারের ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ফসল সংগ্রহের পরিকাঠামোগত দুর্বলতার কারণে বিভিন্ন রাজ্যের গরীব কৃষকরা ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের সুবিধা লাভ করতে পারে না। তারা তাদের উৎপাদিত শস্যের অধিকাংশটাই 'অভাবী বিক্রি' করে দিতে বাধ্য হয়। লাভ হয়েছে তুলনায় ধনী কৃষকদের, আড়তদার, মজুতদারদের। চাষের উপকরণগুলির যথাযথ ব্যবহার ও ভাল বাজারের সুযোগ নিতে পারার কারণে জোতদার ও বড় চাষিরা গরীব চাষির তুলনায় চাষ থেকে অনেক বেশি লাভ করতে পারে। এসবেরই ফলে দ্রুত হারে বাড়তে থাকে গরীব কৃষকদের জমি হারানো। দারিদ্র্য ও হতাশায় কৃষক-আত্মহত্যার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

খুব পিছিয়ে পড়া অঞ্চল বাদে কৃষি কাজে যন্ত্রের ব্যবহার বহু গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে গরীব কৃষক ও কৃষি-শ্রমিকদের অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ভারতে চুক্তি-চাষ (কন্ট্রাক্ট ফার্মিং), কর্পোরেট ফার্মিং অনেক গুণ বেড়েছে। স্পেশাল ইকনোমিক জোন (SEZ) গঠন করা হচ্ছে। এর ফলে বৃহৎ পুঁজি অনেক সুবিধা পাচ্ছে। কোনো কোনো সমাজবিজ্ঞানীর মতে গ্রামীণ ক্ষেত্রে বৃহৎ পুঁজির বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রবেশের ক্ষেত্রে ধনী কৃষকরা সহায়ক শক্তি হিসেবে ভূমিকা পালন করছে।

ভারতের বেশ কিছু রাজ্যে সরকার এস.ই.জেড.-এর জন্য জমি দখল প্রক্রিয়া শুরু করলে স্থানীয় কৃষকরা সংগঠিতভাবে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু করে।

পুঁজি ও বাজার-নির্ভর কৃষি অর্থনীতির বিকাশের ফলে ৭০-এর দশকের শুরু থেকেই ভারতে কৃষক আন্দোলনের চরিত্রগত পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে। নান দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতে সচ্ছল কৃষকদেরও (farmers) আন্দোলন সংগঠিত করার ক্ষে

ভূমিকা গ্রহণ করতে দেখা যায়। সচ্ছল কৃষকদের নেতৃত্বে পরিচালিত কৃষক আন্দোলন উত্তরপ্রদেশ, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব এবং গুজরাটে সংগঠিত হতে দেখা যায়।

অনেক সমাজবিজ্ঞানী প্রজাসত্ত্ব কৃষক (Peasants) এবং সচ্ছল কৃষক (Farmers)-এর মধ্যে ধারণাগত পার্থক্য করেন। তাদের কাছে প্রজাসত্ত্ব কৃষক বা 'পিজ্যান্ট' হলো সামাজিক বর্গ (social category)। এই দরিদ্র কৃষকরা সব অর্থেই পিছিয়ে পড়া, কোনো রকমে জীবন কাটায়। জমির মালিকের সঙ্গে তাদের নানা সামাজিক বাধ্যবাধকতার সম্বন্ধ। সাম্প্রতিক ভারতে আমরা দেখি বাজার-নির্ভর কৃষক (Market oriented farmers), যাকে আমরা বলতে পারি মূলত একটি অর্থনৈতিক বর্গ (economic category)। বাস্তবে সবুজ বিপ্লব, কৃষিতে নতুন নতুন প্রযুক্তি, বিভিন্ন বিষয়ে সরকারী ভর্তুকি সাম্প্রতিক অতীতে ভারতে এই নতুন 'সচ্ছল' বা 'ধনী' কৃষক শ্রেণির উদ্ভব ঘটিয়েছে। এই নব্য ধনী বা সচ্ছল কৃষকদের অংশ গ্রহণে আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে বলে অনেকে এই আন্দোলনকে 'নব্য কৃষকদের আন্দোলন' (New Farmers' Movement) বলে অভিহিত করে থাকেন। ১৯৮০-'র দশক থেকে এই আন্দোলনের শুরু। যদিও ১৯৭০-এর দশকেই বিভিন্ন কৃষক আন্দোলনে এর আভাস পাওয়া যায়। ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী চরণ সিং-এর নেতৃত্বে কৃষকরা বেশ কয়েকটি পদযাত্রা সংগঠিত করে। দাবিগুলির মধ্যে ছিল শিল্পজাত ও কৃষিজাত পণ্যের মধ্যে সমতা, বিদেশ থেকে কৃষি উপকরণ আমদানির অনুমতি, বিভিন্ন বোর্ড এবং কমিটিগুলিতে কৃষকদের যথাযথ প্রতিনিধিত্বের সুযোগ, কৃষকদের ব্যবহৃত বিদ্যুতে, সেচে, সারে, বীজে সরকারী ভর্তুকি বৃদ্ধি, ইত্যাদি। কিষান ব্যাঙ্ক ও কৃষি সংক্রান্ত পলিটেকনিক স্থাপনও তাদের দাবিগুলির অন্তর্ভুক্ত ছিল।

১৯৭৭ সালে শারদ যোশীর নেতৃত্বে মহারাষ্ট্রে কৃষক আন্দোলন সংগঠিত করা হয়। এই কারণে 'কার্পাস' উৎপাদক শ্বেতকারী সংগঠন গঠন করা হয়েছিল। কীটনাশক, সার, বিদ্যুৎ ইত্যাদির মূল্য কমানো, পাশাপাশি তাদের উৎপাদিত ফসলের ক্রয়মূল্য বৃদ্ধি প্রভৃতি তাদের দাবী ছিল। পাঞ্জাবে কৃষক আন্দোলনের মূল দাবি ছিল তাদের উৎপাদিত গমের ক্রয়মূল্য বৃদ্ধি। মহারাষ্ট্রের নাসিকে কৃষক আন্দোলনের প্রধান দাবি ছিল আখ ও পিঁয়াজের ক্রয়মূল্য বৃদ্ধি।

২০০৯ সালের নভেম্বর মাসে ভারতীয় কিষাণ ইউনিয়ন ও রাষ্ট্রীয় লোকদলের আহ্বানে আখের ক্রয়মূল্য বৃদ্ধির দাবিতে লক্ষাধিক কৃষক লোকসভার সামনে ধর্না কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে। মহেন্দ্র সিং টিকায়ত ছিলেন এই আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা। সচ্ছল বা ধনী কৃষকদের আন্দোলনগুলি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় এই আন্দোলনগুলি গড়ে উঠেছে প্রধানত মূল্যকে কেন্দ্র করেই। উৎপাদনের

উপকরণগুলির যেমন সার, বীজ, কীটনাশক, সেচের জল ইত্যাদির দাম কমানো অথবা সরকারী ভর্তুকি দেওয়া। অন্যদিকে তাদের উৎপাদিত শস্যের ক্রয়মূল্য বৃদ্ধি করা। আন্দোলনকারীদের মতে, এর ফলে ভারতে গ্রামীণ দারিদ্র্য এবং অনগ্রসরতা সামগ্রিকভাবে দূর করা সম্ভব হবে।

সাম্প্রতিককালে গরীব কৃষকদের দাবি আদায়ের আন্দোলন সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কৃষি ঋণ মকুব, ভূমিহীন আদিবাসীদের জঙ্গলের জমির পাট্টা, ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য, সেচের সুবিধা এবং কৃষকদের পেনশনের দাবিতে আন্দোলনে নেমেছে মহারাষ্ট্রের কৃষকরা। সারা ভারত কৃষকসভা এবং আরও কয়েকটি কৃষক সংগঠনের নেতৃত্বে এই আন্দোলন সংগঠিতহয়। 'আমচি মুম্বই'-ও এই আন্দোলন সমর্থন করে। লক্ষাধিক কৃষক এই আন্দোলনে যোগ দেন। নাসিক থেকে মুম্বাই তাঁরা পদযাত্রা করেন (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২২/২/২০১৯)। একই দাবিতে নবনির্মাণ কৃষক সংগঠনের ডাকা ১২ ঘন্টার ধর্মঘটে ওড়িশায় জনজীবন ব্যাহত হয়।

কৃষকদের নানা অসন্তোষকে সামনে রেখে ২০১৮ সালে উত্তরপ্রদেশ থেকে দিল্লি পদযাত্রা করেছিল ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘ। যার জেরে কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল দিল্লি। ২০১৯-এর সেপ্টেম্বর মাসে একই কর্মসূচি নেয় এই সংগঠনটি। কৃষকদের প্রধান দাবিগুলি ছিল কৃষি ঋণ মকুব, আখ বিক্রির দাম অবিলম্বে মিটিয়ে দেওয়া, সেচের কাজে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ, কৃষকদের পেনশন, স্বামীনাথন কমিটির প্রতিবেদন কার্যকর করা। ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৯ সহারনপুর থেকে দিল্লির উদ্দেশ্যে যাত্রা করে হাজার হাজার কৃষক। উত্তরপ্রদেশ-দিল্লি সীমান্তের গাজিপুরেই মিছিল আটকে দেয় পুলিশ। আন্দোলনকারীরা ব্যারিকেড ভেঙ্গে এগনোর চেষ্টা করলে পুলিশের সাথে সংঘর্ষ বাধে। কৃষি মন্ত্রকের আধিকারিকরা আন্দোলনকারীদের বেশ কিছু দাবি মেনে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলে আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০১৯)।

উপসংহার

দ্রুত পরিবর্তনশীল এই সময়ে ভারতের কৃষি-অর্থনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। নব্য উদারনৈতিক অর্থনীতির (Neo-liberal Economy) প্রভাব ভারতের কৃষি পরিকল্পনায় অনেকটাই স্পষ্ট। সরকারি নির্ভরতা নয়, মুক্ত বাজার অর্থনীতিই হলো কৃষি ও কৃষকের উন্নয়ন সম্পর্কিত যে কোনো পরিকল্পনার মূল ভিত্তি। ভারতের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি এই ধারণায় প্রভাবিত হয়েছে। বিশ্ব ব্যাঙ্ক, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা কিংবা আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের মতো সংস্থাগুলির সাথে বিভিন্ন চুক্তির বাধ্য-বাধকতার কথাও এক্ষেত্রে অস্বীকার করা যায় না। এদের ভাবনায় যথার্থ ভূমি

সংস্কারের মাধ্যমে প্রকৃত কৃষকদের জমি ও চাষের অধিকার দেওয়ার কথা গুরুত্ব পায় না। সরকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে স্বল্প সুদে কৃষকদের বিভিন্ন প্রয়োজনে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের বন্দোবস্ত করার বিষয় অগ্রাধিকার পায় না। প্রতিযোগিতামূলক বাজার অর্থনীতিতে পুঁজি ও আমদানী করা উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে মুনাফা বৃদ্ধিই এর মূল লক্ষ্য। এর ফলে ধনী কৃষক আরও ধনী হয়েছে। কৃষিতে কর্পোরেটাইজেশন হয়েছে। গরীব কৃষক তার অধিকারের সামান্য জমিটুকু হারিয়ে ভূমিহীন ক্ষেতমজুরে পরিণত হয়েছে। অল্প কিছু মানুষের হাতে চাষযোগ্য জমির অধিকাংশটাই কেন্দ্রীভূত হয়েছে। ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে কৃষির বাণিজ্যিকীকরণের মধ্য দিয়ে যার শুরু, উদারীকরণের যুগে এসে আজ তা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্ষুদ্র প্রান্তিক কৃষক ও কৃষি মজুররা কখনো স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে কখনো বা কোনো কৃষক সংগঠনের নেতৃত্বে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এর বিরুদ্ধে আন্দোলন সংঘটিত করেছে। আন্দোলনের প্রকৃতি সব ক্ষেত্রে এক রকম ছিল না। কোনো আন্দোলন সাফল্য লাভ করেছে, কোনোটা আবার অসফল হয়েছে। তাই বলা যায়, শোষণ-নিপীড়ন বা অর্থনৈতিক সঙ্কটের বিরুদ্ধে দরিদ্র কৃষকদের প্রতিবাদী চরিত্র এখনো অমলিন আছে।

সহায়ক গ্রন্থসূচী :

Beteille, A. (1974). Studies in Agrarian Social Structure, OUP. New Delhi.

Desai, A. R. (ed.) (1978). Peasant Struggles in India, OUP. New Delhi.

Gough, A. (1974). "Indian Peasant Uprisings" EPW. Vol. IX No. 32-34.

Guha, R. (1992). Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India, OUP. New Delhi.

Rao (ed.) (1978), Social Movements in India, Vol.-I, Manohar Pub., New Delhi.

Shah, G. (ed.) (2004), Social Movements in India, Sage Pub., New Delhi.

Dhanagare, D. N. (1991), Peasant Movements in India 1920-1950 OUP, New Delhi.

Singha Roy D.K. (2004), Peasant Movements in Post-Colonial India, Sage Pub., New Delhi.

Sahasrabudhey, Sunil (1986), The Peasant Movement Today, South Asia Books, New Delhi.

Commen, T.K. (ed.) (2010), Social Movements : Issues of Identity, OUP, New Delhi.